মা যখন ছোট্ট মেয়ে

মিলন গাঙ্গুলী

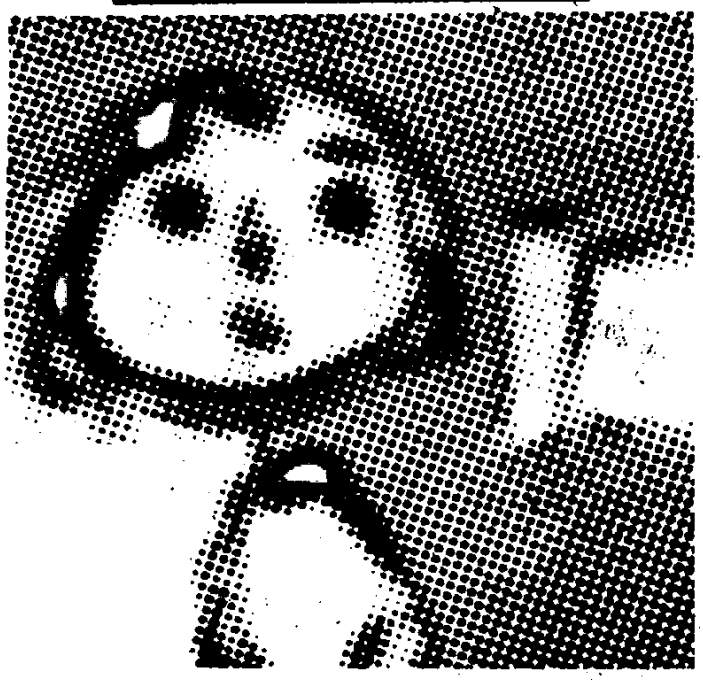

মা যখন ছোট্ট মেয়ে

মিলন গাঙ্গুলী

একবার বর্ষাকালে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলছিল মা।

এক

আমার মা যে এক সময় ছোট্ট একটা মেয়ে ছিল কে জানত?

আমিই কি জানতাম নাকি?

জানলাম যখন বাসার ছবির অ্যালবামের মধ্যে মা-র স্কুল জীবনের একটা ছবি পেলাম তখন। ছবিটা সাদাকালো। তাতে মা আর মায়ের এক বান্ধবী বসা। মায়ের চুলগুলো পিছন দিকে টেনে বাঁধা। পনি ঘোড়ার লেজের মত। কোলের উপর ধরা ঢাউস একটা বই। কী শান্ত আর সুন্দর দেখতে মা। পুরানো দিনের সিনেমার নায়িকাদের মত। যখন নায়িকাগুলো অযথা ঝাঁপাঝাঁপি করত না।

মায়ের শৈশব কেটেছে একা। আর কোনও ভাই বোন ছিল না মায়ের। মা যখন খুবই ছোট...এই বয়স যখন মাত্র দুই বছর, তখন তার মা অর্থাৎ আমার দিদিমা পটল তুলেছিল। কতটুকু পটল তুলতে পেরেছিল তা অবশ্য আমি জানি না।

বাধ্য হয়ে মা-র ছোট্ট বেলা কেটেছে তার ঠাকুরমার কাছে। ঠাকুরমা ভালই ছিল। তবে মা-কে দিয়ে প্রচুর কাজ করাত। নিজে খুব একটা কাজ করতে চাইত না। আর তার রান্না ছিল খুবই বিচ্ছিরি। প্রচুর ঝাল দিত। তখন ইলিশ মাছ সস্তা ছিল। পুরো ইলিশের মৌসুমটা প্রত্যেক দিন ইলিশ মাছ রান্না করত বাসায়। বিরক্তিকর।

রান্না হত পাটপাতার ঝোল, কলমি শাকের ঝোল, চালতার ডাল। হাতের তালুর মত বড় পুঁটি মাছ ভাজা। অথবা ঝোল। এত ঝাল! খেতে কষ্ট হত মা'র। উপায় কী? খাওয়া নিয়ে অভিযোগ কার কাছে করবে?

তবে প্রায় বিকেলে মা তার বাবার সাথে হাঁটতে বের হত। তখন রাস্তা-ঘাট ছিল সুনসান। নীরব। কতদূর চলে যেত বাবা আর মেয়ে। শেষে একটা মিষ্টির দোকানে বসে দই আর মিষ্টির অর্ডার দিত দাদু মার জন্য। অনেক সময় নিয়ে মা পাখির মত অল্প অল্প করে খেত দই-মিষ্টি। তারপর আবার হেঁটে বাড়ি ফিরত দুজন।

পথে কত দোকানপাট। ছিট কাপড়ের দোকান। বাহারি জুতার দোকান। একটা দোকান ভর্তি আলতা, চুড়ি আর লেইস ফিতা। চারকোনা বোতল ভর্তি সুগন্ধি তেল। চিনি, গুড় আর হীরার খনির মত মিছরির দোকান। মায়ের বয়স মাত্র চার বছর। দাদুর হাত ধরে সেগুলো দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরত দুজন।

রেল লাইনের পাশে ছিল বড় এক মসজিদ। মসজিদের দেয়ালে ছোট ছোট চিনামাটির টাইলসের কারুকাজ। মা ভাবত অনেকগুলো চিনামাটির পেয়ালা আর তশতরী ভেঙে পরে দেয়ালটা বানিয়েছে রাজ মিস্ত্রীরা।

মসজিদের পাশে বড় একটা রুটির দোকান। এর সামনে দিয়ে গেলেই চমৎকার একটা ঘ্রাণ পাওয়া যেত। শীতের বিকেলে মা অবাক হয়ে দেখত ভিতরে ডালিমের দানার মত গনগনে কয়লার আগুন জ্বলছে। একটা রোগা পটকা লোক ব্যস্ত-সমস্ত ভঙ্গিতে কাজ করছে। লম্বা বৈঠার মত একটা কাঠের টুকরো করে আগুনের কুণ্ডের ভিতরে রুটি রাখছে একটার পর একটা।

বিশাল এক একটা রুটি। নরম। কী মিষ্টি ঘ্রাণ। আর স্বাদ। দাম মাত্র দশ আনা। শীতের সন্ধ্যাগুলোতে ফেরার পথে ঢাউস এক পাউরুটি নিয়ে বাড়ি ফিরত দুজন।

রাস্তাঘাটগুলো সন্ধ্যার পর ভূতের গলির মত হয়ে যেত। ঘন্টাখানেক পর টুংটাং ঘন্টা বাজিয়ে চলে যেত দু'একটা রিকশা। শেয়ালের ডাক শোনা যেত দূরের ঝোপঝাড়ে। কুয়াশা পড়ত তখন খুব। নীল রঙের। আর মিষ্টি একটা ঘ্রাণও থাকত কুয়াশাতে।

তখন চা-য়ের চল খুব একটা হয়নি। এখনকার মত দশকদম পর পর চা-য়ের দোকান তখন কল্পনাও করতে পারত না মানুষ। অনেকের কাছেই চা ছিল বিলাসিতা। টাকা গরম পানিতে গুলিয়ে 'চুকচুক' করে খাবার মতই।

কিন্তু মায়ের বাড়িতে চা চলত বেশ। চায়ের স্বাদ মা প্রথম পেয়েছিল কলকাতা হাওড়া ইস্টিশনে গিয়ে। মাটির ভাঁড়ে করে কলকাতায় চা দিত সে সময়। শুধু মাত্র ভাঁড় সংগ্রহের লোভে চা খেত মা।

শীতের সন্ধ্যায় মাটির চুলাতে চা বসাত মায়ের ঠাকুরদা। সে সময় 'ব্লু-ক্রস' নামে একটা কনডেন্সড মিল্ক খুব চলত। সেটাই আনা হত বাসায়। প্রচুর কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে খাকি রঙ বানিয়ে চা খেত দাদু আর নাতনি। বাইরে ঝুম ঠাণ্ডা। শরীরে চাদর জড়িয়ে চুলার পাশে ওমের জন্য বসে থাকত ছোট্ট মা আমার। হয়তো ভাবত তার মায়ের কথা! কোথায় গেল সে? এক রত্তি মেয়েটাকে ফেলে! মেঘের পাড়ের দূর কোনও দেশে?

বাড়ির বাইরে ছিল অনেকগুলো বাঁশ ঝাড়। সারা রাত ধরে শনশন করে অদ্ভুত এক শব্দ হত। অপার্থিব। ভয় পেত মা। বুড়ি ঠাকুর মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাত।

শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেত ঝুড়ি ভর্তি কমলা। মায়ের কাছে শীত মানেই কমলা। কমলা খেয়েই শীতের সকালগুলো পার করে দিত মা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে মাত্র তিন বছর বয়সে মা-কে নিয়ে স্কুলে ভর্তি করা হলো। ব্যাপারটা হয়তো শিশুশ্রমের পর্যায়ে পড়ে যায় (মজা করলাম) কিন্তু উপায় ছিল না। বাড়িতে মা আর বুড়ি ঠাকুরমা একা। আর কোনও বাচ্চা-কাচ্চা নেই। কাজেই স্কুলে গেলে খেলার সাথী পাবে এমন মনে করেই এ কাজ করা হলো।

কাজের কাজ হলো সেটা।

স্কুল জীবন খুবই মজা লাগল মায়ের কাছে। অনেকখানি হেঁটে স্কুলে যেতে হত। কুছ পরোয়া নেই। তাই যেত মা। ছুটি হলে অপেক্ষা করত গেটের বাইরে। ঠাকুরমা গিয়ে নিয়ে আসত।

কালো কুচকুচে স্লেট-পেনসিল কিনে দেয়া হলো। নতুন এক জোড়া স্যাণ্ডেল। স্কুল থেকে ফ্রি পাওয়া গেল সবুজ সাথী টাইপের বই। আরেকটু বড় হতেই দু'টো বাঁধানো খাতা। স্কুলের বাইরে হরেক পদের খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ফেরিওয়ালারা, আচারওয়ালা, আইসক্রিমওয়ালা, আর হাওয়াই মিঠাইওয়ালা।

বড়সড় একটা কাঠ আর কর্কশীট দিয়ে বানানো পেটি ভর্তি থাকত আইসক্রিম। দুধ মালাই ১ আনা করে। মনমাতানো দুধের স্বাদ। সাথে কিশমিশ দেয়া। রঙিন আইসক্রিম ২

পয়সা করে। সাদা, লাল আর মাখন রঙা। আর পাওয়া যেত চকবার। ২ আনা করে।

আচার ভাল লাগত না মায়ের। বদলে পছন্দ করত 'গোলগোল্লা'। ময়দার তৈরি মিষ্টি একটা গোলাকার জিনিস। ডুবো তেলে ভাজা। দারুণ। তা ছাড়া গোলগোল্লার বড় সুবিধে এই যে মাত্র একটা 'গোলগোল্লা' খেতে খেতেই বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যেত সহজে।

সে তুলনায় হাওয়াই মিঠাই বড্ড ঠক পড়ে যায়। এক আঁটি ১ আনা করে। মিঠাইওয়ালার সামনে থাকে একটা মেশিন। যেটাতে চিনির মিহি গুঁড়ো দিয়ে মেশিনটা চালু করলেই জালের মত জমা হতে থাকে মিঠাইগুলো। হাত দিয়ে তুলে আঁটি বানিয়ে ফেলে মিঠাইওয়ালা। সাদা আর গোলাপি মেঘের দলা যেন এক একটা। ইয়া বড়। কিন্তু মুখে দিলেই ফুস্। একটা খেলে পোষায় না। আরেকটা কিনতে হয়। আমার ছোট্ট মায়ের কাছে অত পয়সা কই? আমিও ত্যে তখন নেই ধারে কাছে!

বরং ১ আনা দিয়ে হাতি-ঘোড়া বিস্কুট কেনা যেত অনেকগুলো। মোট ১৬টা বিস্কুট পাওয়া যেত। দোকানে কাঁচের বিশাল বয়ামে ভর্তি থাকত সেগুলো। বুড়ো এক দোকানদার বসে বসে ঝিমুত। মা গিয়ে চকচকে নক্ষত্রের মত একটা ১ আনার মুদ্রা দিয়ে বলত, 'দাদু, বিস্কুট দ্যান।'

দাদু ১৬টা বিস্কুট দিলে মা ভাল করে দেখত একই রকম বিস্কুট দুটো পড়েছে কিনা! নানান জীবজন্তুর ছাপ দেয়া ছিল সেগুলো। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, মাছ, পাখি, জিরাফ, হনুমান...

একই রকম দুটো জন্তু বা জানোয়ার পড়ে গেলে মা অনুরোধ করত 'দাদু, এটা বদলে দ্যান।'

মাঝে সাঝে বিরক্ত হত দোকানদার দাদু। কারই বা ভাল লাগে ঝিমুনি বাদ দিয়ে নতুন করে বিস্কুট খুঁজে দিতে। ঢাউস কাঁচের বয়ামটা এগিয়ে দিতেন মায়ের সামনে। বলতেন, 'তুই বাইচ্ছা ল।'

মা চটপট বেছে নিত পছন্দের জীবজন্তু বিস্কুটগুলো। দোকানি আবার ঝিমুচ্ছে। ইচ্ছে করলেই মা দু'চারটে বিস্কুট বেশি নিতে পারে। কিন্তু এ সময়ই মায়ের ভিতরে সততা চেপে বসে বেশি করে। আস্তে করে বলে, 'দাদু, দুটো বিস্কুট বেশি দ্যান।'

আবার ঝিমুনি ভেঙে যেতে যারপর নাই বিরক্ত হন দোকানি। বলেন, 'নেহ্।'

দুটো অতিরিক্ত বিস্কুট নিয়ে কাগজের ঠোঙা ভর্তি করে বাসায় ফিরত মা। দুই বেণী ঝুলিয়ে।

দুই

স্কুল থেকে ফিরে আবার কাজ করতে হত মাকে। ঘর ঝাড়ু দেয়া, থালা বাটি ধোয়া, আরও হাজার কাজ। চার বছরের একটা ছোট্ট মেয়ের জন্য একটু বেশি বটে। কিন্তু সেটা বলবে কে? মায়ের বাবা সারাদিন বাইরে জীবিকার জন্য। ঠাকুর দাদাও তাই। বুড়ি ঠাকুরমা অলস আগেই বলেছি।

সন্ধ্যার পর পড়তে বসত মা। কমলা আলো জ্বলত হারিকেনে। স্লেটে বসে বসে লিখত মা আমার। দুই তিনদিন পর পর কালো কয়লা দিয়ে আচ্ছামত মেজে ঘষে নিত স্লেটটা। এতে আরও কালো কুচকুচে হয় স্লেট। লিখতে ভাল লাগে।

সন্ধ্যার পর একা বসে বসে পড়ত মা। বাইরে ঠাকুরমা আড্ডা মারছে প্রতিবেশী মহিলাদের সাথে। হেনতেন কত কী! এই সময়টাতে বেশ ভয় ভয় লাগত। নানান ধরনের ভূতের গল্পগুলো মনে পড়ত একটা একটা করে। হারিকেনের আলোতে চারপাশে বড় বড় ছায়া পড়ত। এমনকী নিজের ছায়াটাকেও অচেনা মনে হত তখন। মনে হত মাচার উপর ঘাপটি মেরে বসে আছে অচেনা দানো। প্যাঁচার ডাক, বেড়ালের কান্না, ওহ্! ওদিকে বাইরে বুড়ি আড্ডা মারছে তো মারছেই। মা বাইরে গেলেই খেঁকিয়ে উঠবে সে। তবে এর কিছু পরই দাদু আসত বাজার নিয়ে। আরও একটু বেশি রাতে ফিরত বাবা। ভয়গুলো কোথায় পালাত তখন!

স্কুলে যেটা ভাল সেটা হচ্ছে দিদিমণিগুলো ভাল। যত্ন করেই পড়া দিত। এখনকার মত মোবাইল ফোনে গেইম খেলত না দিদিমণিরা। আর মাঝেমধ্যেই উপহার

পাওয়া যেত। যেমন–একবার দেয়া হলো প্যাকেট ভর্তি আটটা করে খেজুর। বুড়ো আঙুলের সমান বড় বড়। মনে হয় গুড়ের ঢেলা। আর একবার এল গুঁড়ো দুধ। তখন সবাই বলত 'বিলাতি দুধ'। আজকাল যেমন অনেক উজবুক টমেটোকে বলে বিলাতি বেগুন (!) সে রকমই।

স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে গুঁড়ো দুধ দেয়া হচ্ছে। মাও গিয়ে দাঁড়াল লাইনে। দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন, 'নিবি কীভাবে?'

'তাই তো! কী করা!'

বড় ক্লাসের একটা মেয়ে দেখিয়ে দিল কীভাবে একটা টুকরো কাগজ কায়দা করে মোচড় দিলেই সেটা একটা 'কোণ' হয়ে যায়। আর সেটাতে ভর্তি করে নেয়া যায় তুষারের মত গুঁড়ো দুধ। স্কুল ছুটির পর চোঙা ভর্তি মানে কাগজের কোণভর্তি গুঁড়ো দুধ নিয়ে হাঁটা ধরল মা বাড়ির দিকে। অর্ধেক উড়ে গেল বাউ কুড়ানি বাতাসে। সেগুলোর লোভে পিছন পিছন আসতে লাগল ডাইনোসরের একটা বাচ্চা। মানে বিশাল একটা কুকুর আর কী!

দিনগুলো ভাল যাচ্ছিল মায়ের।

একদিন স্কুলের বাইরে দেখা গেল আজব একটা লোককে। লোকটা রোগা চিমসে ধরনের। মাথায় লাল গামছা বাঁধা। ঢোলা একটা ফতুয়া পরনে। লোকটার সামনে সিন্দুকের মত কাঠের বড় এক বাক্স। তাতে জাহাজের জানালার মত অনেকগুলো গোল গোল কাঁচের জানালা। সেগুলোতে মুখ-চোখ ঠেকিয়ে ছেলে-মেয়ের দল কী যেন দেখছে। আর লোকটা সুর করে ছড়া কাটছে–

'আগ্রাকা তাজমহল দেখ্।
বান্দর কা নাচ দেখ।
কী সুন্দর দেখা গেল...'

মা বুঝতে পারল বায়স্কোপ।

এত ভিড়। সবাই দেখছে। এক আনা করে। এক আনা অনেক পয়সা। বায়স্কোপ দেখতে গেলে খাওয়ার জন্য কোনও পয়সা থাকবে না। মনটা খারাপ হয়ে গেল মায়ের। আগেই বলেছি–আমি সেই সময় ছিলাম না।

কিন্তু বায়স্কোপের ভূতটা মাথা থেকে গেল না মায়ের। কী আছে সেই রহস্যময় বাক্সের ভিতরে? কুতুব মিনার বা তাজমহল, রেসকোর্সের ময়দান এইসব আসবে কী করে বাক্সের ভিতরে?

পরদিন চিমসে লোকটা রহস্যময় বায়স্কোপের বাক্স নিয়ে আবার এল। সুর করে ছড়া (নাকি গান?) কাটতে লাগল। আজও দারুণ ভিড় হলো। কাচ্চা-বাচ্চা, ছেলে-বুড়ো সবাই ঠেলাঠেলি করে দেখছে কাঁচের গোল জানালাতে মুখ ঠেকিয়ে। একটা শো শেষ হলেই মুড়ির টিনের ঢাকনা দেয়ার মত ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে ফেলছে জানালাগুলো। লোকটা ভারি বজ্জাত। এক চিলতে ফ্রি দেখার উপায় নেই কারও।

মাত্র ১ আনা পয়সার জন্য দেখা হচ্ছে না অপার্থিব ওই জিনিসগুলো। ঢাউস বাক্সের ভিতরে আরেক ডাইমেনশন। রহস্যপুরী। তা ছাড়া প্রতিদিন ১ আনা পয়সা হাতেও থাকে না মায়ের। দু'একবার চেষ্টা করেছিল বান্ধবীদের সাথে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ফ্রি দেখা যায় কী না! মাত্র কয়েক সেকেণ্ড হলেই চলবে! ব্রেনের কোষে কোষে থেকে যাবে সেগুলোর চিরস্থায়ী ছাপ। কিন্তু বান্ধবীগুলোও বড় স্বার্থপর। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যও ওরা ছাড়তে চায় না কাঁচের জানালাগুলো।

শেষে এক সপ্তাহ পর নিজেকে আর বঞ্চিত করতে পারল না মা। টিফিনে কিছু না খেয়ে ১ আনা পয়সা তুলে দিল চিমসে বায়স্কোপওয়ালার হাতে। আজ বড় খুশির দিন মায়ের।

অধীর আগ্রহে চোখ রাখল কাঁচের জানালাতে। উত্তেজনায় চোখ দুটো খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ ডিমের মত বড় বড় হয়ে গেছে। শুরু হলো অনুষ্ঠান। ক্যানক্যানে গলায় ছড়া কাটতে শুরু করল বায়স্কোপওয়ালা। কিন্তু একী? কোথায় সেই বুড়ি গঙ্গার ইসটিমার? কোথায় মতিঝিলের শাপলা? লণ্ডনের ঘড়ি? তাজমহল?

ভিতরে কাগজের উপর রঙিন ছবি সাঁটানো! ব্যস! এই-ই। চিমসে লোকটা হ্যাণ্ডেল ঘুরাচ্ছে। ছবিগুলো একটার পর একটা

দ্রুত চলে যাচ্ছে। আর কিছু না! কিন্তু এর চেয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি তো মায়ের বাসায় দেয়ালে আঠা দিয়ে সাঁটানো আছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল মায়ের। বাচ্চা শিশু আহ্লাদে বেলুন নিয়ে খেলার সময় আচমকা বেলুন ফেটে গেলে যেমন হয়, তেমনই হলো।

সেদিন শুকনো মুখে বাড়ি ফিরল মা। জীবনে আর কখনওই দেখেনি বায়স্কোপ!

তিন

সকাল বেলা তা শীতই হোক বা গরম, বেতের ছোট্ট একটা ঝুড়ি নিয়ে ফুল তুলতে যেত মা। তখনকার দিনে প্রায় সব হিন্দু বাড়িতেই ফুলের বাগান থাকত। ফুল নিতে গেলে তেড়ে মারতে আসত না কেউ। মা ফুল সংগ্রহ করত। কত পদের ফুল গাছ–বোতাম ফুল, সূর্যমুখী, ডালিয়া, নয়নতারা, কলাবতী, দোপাটি, লিলি, গাঁদা, ভুঁইচাপা, দোলনচাপা, রজনীগন্ধা, কদম, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া।

পুকুর ভর্তি সাদা সাদা শাপলা। অন্য গাছপালাও কি কম নাকি? রঙ বেরঙের পাতাবাহার, গীমাশাক, সুষুনি শাক, লজ্জাবতী গাছ, শ্যামালতা, বনমেথি, টাকা পাতা, বন পালং, বনতুলসী, আরও কত কী!

মায়ের মজা লাগত এক ধরনের ক্যাকটাস গাছ দেখে। সবুজ নানরুটির মত। তাতে কাঁটা ভর্তি। আরেকটা ক্যাকটাস গাছ তো দারুণ। মনে হয় কেউ তাকে 'হ্যাণ্ডস আপ' বলেছে, আর সে হাত দুটো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তুলে দাঁড়িয়ে আছে! দারুণ না? সেই ছোট্ট বেলাতেই মা গাছপালা বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল। (ইচ্ছা করলেই নার্সারির ব্যবসা শুরু করতে পারে মা এখন!)

নতুন ক্লাসে উঠতেই মায়ের একজন মাস্টার দরকার হয়ে পড়ল। যিনি অন্তত অংক আর ইংরেজিটা একটু বুঝিয়ে দিতে পারবেন। বাবা আর ঠাকুরদা ফিরত অনেক রাতে। অনেক রাত মানে রাত আটটা কি নয়টা। সে সময় অনেক রাত। এখন তো ক্লাস থ্রি বা ফোরের একটা পুঁচকে বাচ্চাও রাত এগারোটার সময় টিভির সামনে বসে। 'ক্ষুদে নর্তক আর গায়ক' কম্পিটিশন দেখে, বা 'কৌন বনেগা ভগ্নিপতি' টাইপের অনুষ্ঠান দেখে। তখন সে সব হবার জো ছিল না।

তা ছাড়া বাড়ির মানুষের কাছে পড়াও হয় না সে রকম। আদরের আতিশয্যের কারণেই। কাজেই মায়ের ঠাকুরদার এক বন্ধু জীবন বাবুর কাছে লেখাপড়া শুরু হলো মায়ের। জীবন বাবুর বাড়িতে যে জিনিসটা প্রথমেই মাকে মুগ্ধ করল তা হচ্ছে কলের গান। অদ্ভুত একটা যন্ত্র। সাথে সেঁটে আছে সন্ধ্যা মালতী ফুলের মত দেখতে বিশাল একটা পিতলের চোঙ। বড় বড় কালো রুটির মত রেকর্ড। সেগুলো চড়িয়ে দিয়ে পিন বসিয়ে দিলেই পিতলের চোঙ দিয়ে গান বের হয়। এ সব আবার কী?

কোথায় পাওয়া যায় এই সব বিচিত্র জিনিস? জীবন বাবুর বাসায় পড়তে গেলেই দেখা যেত ভদ্রলোক ইজি চেয়ারে বারান্দাতে বসে আছেন। বাইরে গাছপালার ঠাসবুনট। ভিতর থেকে কলের গান ভেসে আসছে...'কত দিন দেখিনি তোমায়...'

প্রচুর গানের রেকর্ডে ঠাসা ছিল জীবন বাবুর বাসা। তাঁর মেয়ে কলকাতা থেকে পাঠাত প্রতিমাসেই নিত্য নতুন রেকর্ড।

আরেকটা অবাক করা জিনিস হচ্ছে, কাঠের বড় একটা দেয়াল ঘড়ি। ইয়া বড়। টক্ টক্ করে কাঁটাগুলো চলছে। ভিতরে হাতের মুঠোর মত বড় একটা দোলক দুলছে অল্প অল্প। প্রত্যেক ঘণ্টায় পিলে চমকে দিয়ে সেটা ঠন্ ঠন্ করে বেজে উঠত। ঘড়িটার দাম নাকি সাত টাকা।

মাগ্গোমা। এর মানে জীবন বাবুরা অনেক বড়লোক। এই প্রথম মা বুঝতে পারল তারা অনেক, অনেক, অনেক গরিব। মনটা বেশ খারাপই হয়ে গেল তার।

জীবন বাবুর বাড়িতে অদ্ভুত আর দুর্লভ সব জিনিসের ছড়াছড়ি। যেমন কাঁচের বড় এক গোল্লা। ভিতরে রঙিনফুল। রঙের ফোঁটা দিয়ে বানানো। জিনিসটা আসলে পেপার ওয়েট। কী ভারি! হাত থেকে পড়ে গেলে বুড়ো আঙুল থেঁতলে যাবে। রান্নাঘরে পিতলের দারুণ একটা চুলা। ঝক্‌মক্ করছে স্পেসশিপের মত। কেরোসিন দিয়ে পাম্প করলেই সুন্দর নীলরঙের আগুন জ্বলে। মায়ের বাসায় মাটির

তিনটে নাকওয়ালা চুলা। বেহায়ার মত হাঁ করে থাকে। ওখান দিয়েই কাঠ আর কয়লা দিতে হয়। রান্নার সময় ধোঁয়া। খুবই কষ্ট হয় রান্না করতে ছোট্ট আমার মায়ের। ও রকম একটা পিতলের চুলা কেনা যায় না? নীল রঙের আগুন জ্বলবে। আগুনটা কত ভদ্র! একটু ধোঁয়া বের হয় না। মা ঝটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে হাতে টাকা হলে সে নিজেই কিনবে এমন একটা চুলা।

জীবন বাবু নিজের মেয়ের মতই যত্ন করে মাকে লেখাপড়া শেখাতেন। সন্ধ্যাবেলা পড়া শেষ হবার পর তাঁর বাড়ির লোকজন অনেক সময় খাইয়ে দিত মাকে। বেশিরভাগ সময় পিঠা পায়েস জাতীয় কিছু একটা।

সেই সময় একা একা হেঁটে বাড়ি ফিরত মা। বাইরে ধূসর অন্ধকার। দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকত মা।

একবার বর্ষাকালে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলছিল মা। বাড়ির কাছটাতে রাস্তাঘাটে বেশ জল জমে ছিল। আর ছিল কতগুলো ছিন্নমূল কচুরিপানার স্তূপ। বেতফলের মত অন্ধকার জায়গাটা। দ্রুত হাঁটছিল মা। হঠাৎ করেই পায়ের তলায় চাপা পড়ল পৃথিবীর আদিম কুৎসিত প্রাণীটা। সড়াৎ করে চলে গেল সেটা। ভাগ্য ভাল মায়ের। দৌড়ে বাড়ি ফিরল ছোট্ট মেয়েটা বই খাতা বুকে চেপে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে তার।

সে রাতে ভয়ে ভয়ে কাটল মায়ের। কোথায় যেন শুনেছিল ব্যথা পাওয়া বা আহত সাপ রাতের বেলা বাড়িতে এসে কামড়ে প্রতিশোধ নিয়ে যায়! বাপ্‌স্, কী ভয়ঙ্কর! বেশ অনেকগুলো দিন ভয়ে কেটেছিল মায়ের।

চার

দিন কেটে যায় স্বপ্নের মত। ঝরা শিশিরের মত রাত আসে। ঋতু বদলায়। শীত, গরম, বর্ষা যায়। মা যখন ক্লাস ফোরে উঠল তখন টুক করে মরে গেল তার বাবা। চমৎকার! কে যেন বলেছিল, 'ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্যই করেন!' ভদ্রলোককে একলা কোনও নির্জন রাস্তায় পেলে দেখাতাম মজাটা! এই সব কি ঈশ্বরের ভাল করার নমুনা? আর ভাল কাজগুলো তিনি বেছে বেছে শুধু একজনের জন্যই করে থাকেন?

ছোট্ট মা আমার বুড়ো ঠাকুরমা আর ঠাকুর দা-র কাছে বড় হতে লাগল। বাবাকে নিয়ে তার কত স্মৃতি! শীতের সন্ধ্যাগুলোতে বাবার হাত ধরে কত দূর পর্যন্ত হেঁটে যেত মা। কত কিছু দেখে বাড়ি ফিরত! একটা বড় ছাপাখানার সামনে গিয়ে অবাক হয়ে দেখত, ভিতরে কাকের পালকের মত আধো আলোছায়া। একজন বুড়ো কাজ করছে। চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। চশমার জন্য চোখ দুটো দুই টাকা দামের রসগোল্লার মত বড় বড় দেখাচ্ছে। লোকটার সামনে বড় একটা বাক্সের মত। অনেকগুলো খোপ তাতে। সেই খোপগুলো ভর্তি সীসের অক্ষর। ব্যস্ত হাতে লোকটা অক্ষরগুলো নিয়ে ব্লকের মধ্যে বসাচ্ছে। দ্রুত। ঝ্যাপাক! ঝ্যাপাক! শব্দ করে কতগুলো কাগজে কী সব ছাপা হচ্ছে।

আরও একটু দূরে অনেকগুলো বই বাঁধাইয়ের দোকান। কতগুলো মহিলা, পুরুষ কাজ করছে সেখানে। পুরানো ল্যাগব্যাগে ছেঁড়া বইগুলো অনেক যত্ন করে সেলাই করে বাঁধাই করে দেয় তারা। খুবই মজবুত হয়। খরচ মাত্র আটআনা। মানে ৫০ পয়সা।

বাবার হাত ধরে দুই পাশের অবাক পৃথিবীটা দেখে বাড়ি ফিরত ছোট্ট মা আমার। মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে সেদ্ধ ডিম কিনে খাওয়া হত। গরম ডিমটা অর্ধেক করে ভিতরে দেয়া হত অচেনা স্বাদের লবণ (আসলে বিট লবণ) আর জাফরানী রঙের ঝাল মসলা।

এক শিশি রক্তরঙা আলতা, চুলের ফিতা আর সুগন্ধি একটা চিরুনি নিয়ে বাড়ি ফিরত দুজন।

বাবা মারা যাবার পর দিনগুলো কষ্টে কাটল মায়ের। সেগুলো বলার দরকার দেখি না। দুঃখগুলো অনাদরে থেকে মরচে পড়ে যাক। সুখ থাকুক যত্ন করে স্মৃতির আলমারিতে তোলা।

বুড়োবুড়ি দু'জন পাখির ডানার মত ভালবাসা দিয়ে জড়িয়ে রাখত আমার ছোট্ট মাকে। মা একা একা রান্না করত, পড়াশুনা

করত আর চমৎকার সেলাই করত রঙ বে-রঙের সুতো দিয়ে। একটুকরো ফেলনা কাপড় আমার মায়ের হাতে পড়লে সেটা হয়ে যেত ইন্দ্রের সভার সিংহাসনের কুশন।

ক্লাস সেভেনে উঠতেই কলম পেল মা দাদুর কাছ থেকে। সাথে এক দোয়াত কালো কালি। তিন চারটে বাহারি কলম ছিল মায়ের। এই সময় দাদু মায়ের জন্য কিনে দিল একটা রূপকথার বই। নাম–রাক্ষসের মায়াপুরী। প্রচ্ছদে দাঁত বের করা ভয়াল এক রাক্ষস। এই বইটাই বদলে দিল মার চিন্তা-চেতনা। বলা দরকার–মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছিলাম বইটা এক্কেবারে ছেলে বেলাতে। সেখান থেকেই আজকে আমি এখানে মানে রহস্যপত্রিকায়। মা চাইত আমি লিখি। তাই।

ক্লাস সেভেনে স্কুলের বেতন ছিল সাড়ে সাত টাকা, যা দেয়া ছিল খুবই কষ্টের! আমার মনে হয় কাহিনিটা ক্রমাগত কষ্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! শেষ করে ফেলি এই সব কষ্ট। কী বলেন?

ক্লাস টেনে ওঠার পর মায়ের বিয়ে হয়ে গেল আমার বাবার সাথে। আমার ঠাকুরদা মানে বাবার বাবা মা-কে দেখে পছন্দ করেছিল ছেলের বউ হিসাবে।

তো, মায়ের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ। আজ কাল হলে আমার বাপকে বাল্যবিবাহের অপরাধে জেল খাটতে হত। সেটা বোধহয় মজার হত। আমি কল্পনায় দেখতে পাই আমার বাবা জেলখানাতে লোহার গারদ ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছে। তার নাক দিয়ে 'সিকনি' মানে সর্দিও ঝরে পড়ছে কান্নার সাথে সাথে। হাঃ হাঃ হাঃ।

যাকগে। তাদের প্রথম সন্তান হলাম এই আমি। মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি জেদী মনোভাব। সৎসাহস আর সব ফ্যান্টাসীকে বাস্তব করার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি। আজ আমি জীবিকার জন্য পৃথিবীর সব প্রান্তে ঘুরে বেড়াই। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ হতে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে। মনটা পড়ে থাকে মায়ের কাছেই। কারণ আমার মা আমার কাছে এখনও ছোট্ট একটা মেয়ে। ■

[উৎসর্গ মাকে, এ ছাড়া আর কাকে?]

প্রকাশিত হয়েছে
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড
রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

ডন ইগনাশিয়ো–শেষ অ্যাযটেক সম্রাটের বংশধর, দখলদার স্প্যানিয়ার্ডদের কবল থেকে মেক্সিকোকে উদ্ধারে বদ্ধপরিকর। জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড–চাকরি-হারানো সুদর্শন অকুতোভয় ইংরেজ। মায়া–রহস্যময়ী এক অপূর্বসুন্দরী মেক্সিকান-ইণ্ডিয়ান যুবতী। যিব্যালবে–স্বার্থপর আর পাগলাটে এক সর্দার। কিংবদন্তির স্বর্ণশহরেই কি এদের পরিণতি লিখে রেখেছে নিয়তি? সেজন্যই কি জান বাজি রেখে যিব্যালবে আর মায়াকে বাঁচাতে গেলেন ইগনাশিয়ো আর স্ট্রিকল্যাণ্ড? সেজন্যই কি স্বর্ণশহর অভিমুখে শুরু হলো অভিযান, ঘটতে লাগল একের পর এক ঘটনা? এবং সেজন্যই কি সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড শপথ করলেন, 'আমার কাছ থেকে মায়াকে আলাদা করতে পারবে না কেউ?' প্রিয় পাঠক, ডন ইগনাশিয়োর লেখনীতে পুরো ঘটনার বর্ণনা স্যর হ্যাগার্ডের কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর জনৈক বন্ধু জোন্স (ছদ্মনাম)। বিশাল সে-কাহিনিরই রূপান্তর এখন আপনার হাতে। সত্যি করে বলুন তো, সুপ্রাচীন মায়া সভ্যতার উপর ভিত্তি করে লেখা বন্ধুত্ব, অ্যাডভেঞ্চার, প্রেম, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর প্রতিহিংসার এই অসাধারণ গল্পের পুরোটা না-পড়ে থাকতে পারবেন আপনি?

দাম ■ এক শ' চল্লিশ টাকা

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com
শো-রুম
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০